বিদ্যাসাগর জননী

ভগবতী দেবী

প্রিয়দর্শন হালদার

সম্পাদনা

প্রণব চৌধুরী

পুনশ্চ

VIDHYASAGAR JANANI BHAGBATI DEVI

Written by Pryadarshan Halder

Edited by Pranab Choudhury

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7572-388-1

Price ₹ 200

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

দাম ₹ ২০০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন -৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সম্পাদকের বক্তব্য

এমন একটি গ্রন্থ, প্রিয়দর্শন হালদারের[১] 'বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী' আবারও প্রকাশ শুধু আবশ্যক নয়, জরুরি ছিল।[২] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) জীবনকথা নিয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬) পথিকৃৎ ভূমিকায়[৩] বাংলা চরিতসাহিত্যে ইতিহাস হলেও, যে মাতৃদেবীর আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁকে নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করলেন প্রিয়দর্শন হালদার। সন্তানের জীবনগঠনে মায়ের ভুমিকা নতুন নয়। রামমোহন-জননী তারিণী দেবী[৪], প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র-জননী আনন্দময়ী দেবী[৫], কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-জননী আনন্দময়ী[৬], রামগোপাল ঘোষ-জননী[৭], কেশবচন্দ্র সেনের জননী সারদাসুন্দরী[৮] প্রমুখ, কিন্তু বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী অতুলনীয়া: 'এই শতাব্দীরই প্রথমার্দ্ধে কর্ম্মবীর ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াসিংটন, ম্যাটসিনি, গ্যারিবলডি, উইলবারফোর্স; ধর্ম্মবীর লিনকন ও থিওডোর পার্কার প্রভৃতির জননীগণ এবং সেবাব্রতধারিণী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল, ভগিনী ডোরা, গ্রেস ডার্লিং, মেরি কার্পেন্টার ও কুমারী কব্ প্রভৃতি মহিলাগণ পৃথিবীর ভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গভূমির কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে এক রমণীরত্ন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনিই আমাদের পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ভগবতী দেবী।'[৯]

তাৎপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: 'বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন।[১০] তাঁর কথিত 'সৌভাগ্যক্রমে' র মধ্যে লুকিয়ে আছে উনিশ শতকের ইতিহাসের এক অনালোকিত অধ্যায়। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মা সারদা দেবীকেই বা কতটা পেয়েছিলেন। সারদা দেবীর মৃত্যুর রাতে এক দাসী শিশু রবিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিল সেই খবর। পরদিন সকালে তিনি দেখলেন তাঁর মা'য়ের শায়িত শবদেহ, সবার সঙ্গে গেলেন শ্মশানঘাটে। বিদ্যাসাগরজননী জন্মেছিলেন উনিশ শতকের গ্রামবাংলায়; অথচ তাঁর প্রজ্ঞা, মহত্ত্ব, লোকাচার, সেবাধর্ম, নৈতিক বাধ্যতা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি চরিত্রমাহাত্ম্যে, সর্বোপরি শুধু সন্তানবাৎসল্য নয়, সন্তানকে যুগোপযোগী করে যুগের চেয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো যুগন্ধর ও যুগোত্তীর্ণ মহাপুরুষকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। সংসার ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে রক্ষণশীলতা বর্জন

করে দুঃসাহসিক প্রগতিশীল বস্তিনিষ্ঠ দৃষ্টি অর্জন ও তার প্রায়োগিক ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য একক অবদান রেখে গিয়েছেন ভগবতী দেবী সমগ্র বাঙালির জীবন-ইতিহাসে।

কেমন ছিল তখনকার যুগের প্রেক্ষাপট? বৃহত্তর বাংলায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (২০ জানুয়ারি ১৮১৭), রামমোহনের কাল (১৮১৫-৩২); ইয়ংবেঙ্গলের কাল (১৮৩৩-৪১); 'তত্ত্ববোধিনী'র কাল (১৮৪১-৫৯)। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ-যুগমধ্যবর্তীভাগে ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান[১০] বিদ্যাসাগর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের 'বাংলার নবযুগ' 'বাঙালির জাগরণের যুগ', 'রিনাসেন্স' 'রেনেসাঁর' যুগের গ্রামবাংলার অবস্থার চিত্র : একান্তই দুশো বছর আগের গ্রামাঞ্চল। সন্ধ্যার পরে পরেই রাতের অন্ধকার। গুটিকতক বাড়িতে স্বল্প সময়ের জন্য জ্বলে রেড়ির তেলের বাতি, শেয়ালের ডাক। যারা বিত্তহীন অথচ ভদ্র পরিবারের, তাদের পরিধেয় বস্ত্র মাত্র একটি, স্নান-সমাপনে তারা সেই বস্ত্রটির একটা খুঁট ধরে রোদে শুকিয়ে তার প্রান্ত অংশটুকু গায়ে জড়িয়ে একইভাবে আবার প্রান্তটুকু রোদে শুকিয়ে পরিধান-রীতি-এমন দারিদ্র্যাবস্থা। বিনিময়ের মাধ্যম পয়সা, পয়সার অভাবে কড়ি (এক পণ বা কুড়ি গণ্ডার মূল্য এক পয়সা)। 'প্রতিটি গ্রামই ছিল যেন এক একটি দ্বীপ, প্রায় শেষের পথগুলি যোজকের কাজ করত।'[১০] সপ্তাহে হাট এক-দু'দিন। দেশে রেললাইন চালু হয়নি। ছিল জলপথ বিত্তবানদের অনেকে এই জলপথে যেতেন অর্থদর্শনে কাশী-হরিদ্বার-প্রয়াগ। গরিব মানুষের স্থলপথে পদযাত্রা। ছিল সড়কপথে পালকি-তাঞ্জাব-এগুলোর মালিকানা বা উৎসস্থলের জন্যে ছিল সাধারণ মানুষের সানন্দ কৌতূহল। ছিল উৎসবপার্বণে ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা বা সখের দলকর্তৃক যাত্রাপালা বা গানের আসর। এগুলো ছিল প্রবহমান দারিদ্র্যপীড়িত ও শ্রেণিবিভক্ত গ্রামবাংলায় আনন্দধারা-বিনোদন, সাত গাঁ ভেঙে সমবেত হত। প্রিয়দর্শন হালদার ভগবতী দেবীর সমকালীন গ্রামবাংলার একান্নবর্তী পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন, তখনকার লোকজনের অর্থ উপার্জনের মধ্যে যে সদ্বয় অভ্যেস ছিল, স্বপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের সেবা, জ্ঞাতিবর্গের যথাশক্তি সাহায্য, মৃত আত্মীয়স্বজনের অনাথ ও নিরাশ্রয় পুত্র-কন্যাদের ভরণপোষণ, ধর্মালোচনা, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারোমাসে তেরো পার্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় ভবনে শাস্ত্রকথা, কথকতা ইত্যাদির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুগৃহস্থোচিত কার্য ছিল, তাতে তাদের আত্মপ্রসাদ; গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা, গৃহস্বামীকে দেবতাবৎ ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন, সংসারে উপার্জনের অপারগ ব্যক্তির শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সংসারে কল্যাণসাধনে যত্নবান হওয়া—এসবের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বলেছেন, গ্রামবাংলার 'হিন্দুর এক একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার সংসার মরুভূমির মধ্যে এক একটি মরুদ্যান ছিল, এক একটি শান্তিনিকেতন ছিল।' (জন্ম ও বাল্যজীবন)

প্রিয়দর্শন হালদারের 'বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী' গ্রন্থের মধ্যে এরূপ

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান একটি বড়ো দিক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এগুলো সংযোজন করেছেন, আলাদা অনুচ্ছেদে; মূল বিষয় নীরস করে দেননি। পাঠকের এটি অতিরিক্ত প্রাপ্তি; তা যে কোনো জীবনচরিতের আবশ্যিক দাবিও।

আবেগেত্মক রচনা হলেও, গ্রন্থটিতে উপজীব্য বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত। 'ভূমিকায়' তিনি একাধারে তাঁর আদর্শবাদ ও ভগবতী দেবী নিয়ে এ ধরনের কর্মে ব্রতী হওয়ার জবাবদিহিতা প্রদান করেছেন আলাদা পর পর দুটি অনুচ্ছেদে:

১. 'মানবদেহ নশ্বর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন গুণের আদর থাকিবে। কারণ, গুণই চিরস্থায়ী— প্রতিভাই চির আদরণীয় ও পূজনীয়। প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তির পরিচায়ক ও তাঁহারই মানুষের আদর্শ।'

২. 'জীবনী সমালোচনা লোকশিকার প্রধান অবলম্বন। করুণার প্রতিমূর্ত্তি, পুণ্যশীলা ভগবতী দেবীর ন্যায় ভাগ্যবতী নারীরত্নের জীবনী সমালোচনায় অনেক শিখিবার আছে। বিশ্বজনীন ভক্তি— প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী আলোচনায় পুণ্য আছে।'

সূচিপত্রে প্রদত্ত অধ্যায়গুলোর মূলত তিনটি পর্যায়:

জন্ম ও বাল্যজীবন, বিবাহ ও বধূজীবন, বিদ্যাসাগরের জন্ম, শিশুচর্য্যা ও সন্তানশিক্ষা, বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষা, পারিবারিক জীবন— এ ছ'টি অধ্যায়ে ভগবতী দেবীর জীবনবৃত্তান্ত: তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের, স্বামী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ, ভগবতী দেবীর বিয়ে ও সংসারজীবন, সন্তানবতী হওয়া থেকে ছেলে-মেয়েদের জন্মদান, জ্যেষ্ঠ সন্তান বিদ্যাসাগরের জন্ম ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি; বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষার বিশদ বিবরণ। এসব অধ্যায়ে ভগবতী দেবীর সঙ্গে অনিবার্য একাত্মতা পরিলক্ষিত বিদ্যাসাগরেরও জীবনচরিত; বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও জীবনগঠনে পিতা ঠাকুরদাসের পরিচর্যা ও সহায়ক নির্দেশনাদান। আদ্যন্ত সাধুভাষার ক্ল্যাসিক্যাল মহিমার মধ্যে প্রিয়দর্শন হালদার সরস-মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে তার সাধুরীতিকে সম্বন্বিত করেছেন অনেকাংশে চলিতভঙ্গিতে।

এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে তৎকালীন প্রতিবেশ চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়েই তিনি ভগবতী দেবীর বিভিন্ন গুণ-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করার প্রয়াসী। কিন্তু তারপরেও তিনি আলাদা আলাদা করে এই মহীয়সীর বিবিধ সদ্‌গুণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন, সেগুলোকে তিনি অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে উল্লেখ করেছেন ভগবতী দেবীর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে 'সে সমুদায় পাঠকগণ তাঁহার (ভগবতী দেবীর) পারিবারিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিবেন।'

লেখক যেভাবে ভগবতী দেবীর পরিচয় বিধৃত করেছেন, তাতে একটি স্পষ্ট বংশতালিকাই আমরা প্রস্তুত করতে পারি। বিদ্যাসাগরের মাতৃকুল :

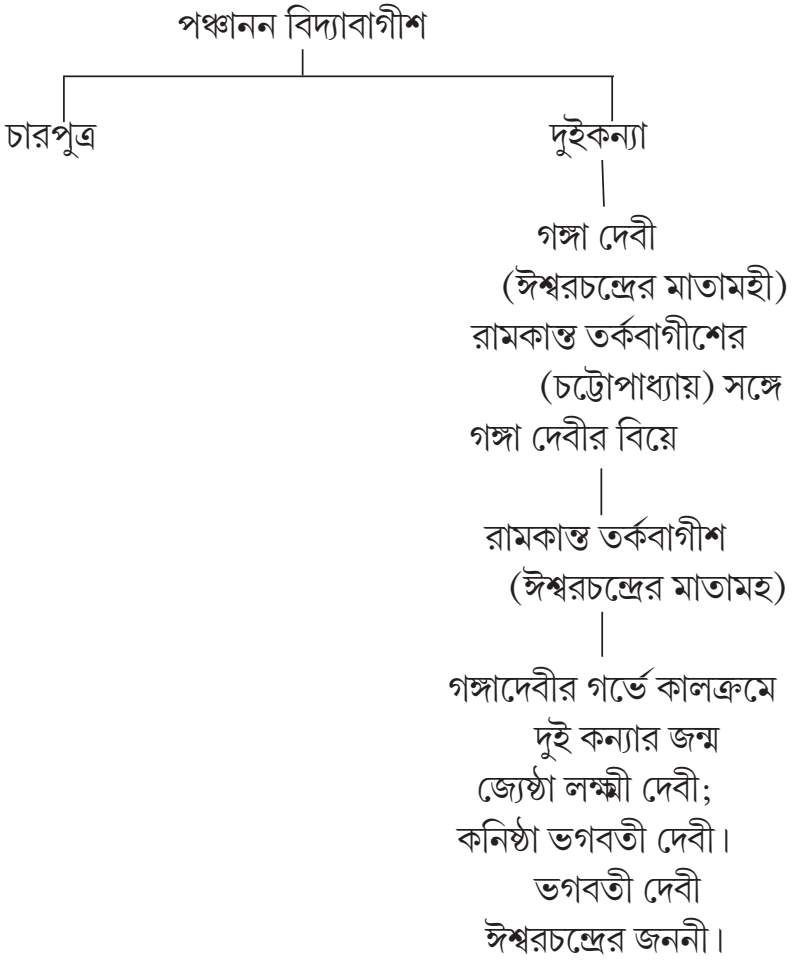

পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ

চারপুত্র

দুইকন্যা

গঙ্গা দেবী
(ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহী)
রামকান্ত তর্কবাগীশের
(চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে
গঙ্গা দেবীর বিয়ে

রামকান্ত তর্কবাগীশ
(ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহ)

গঙ্গাদেবীর গর্ভে কালক্রমে
দুই কন্যার জন্ম
জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী দেবী;
কনিষ্ঠা ভগবতী দেবী।
ভগবতী দেবী
ঈশ্বরচন্দ্রের জননী।

বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কার

পাঁচ পুত্র

তৃতীয় পুত্র
রামজয় তর্কভূষণ।
তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়
উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের
মেয়ে দুর্গার।

তাঁদের দুই পুত্র ও চার কন্যা।
জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস।

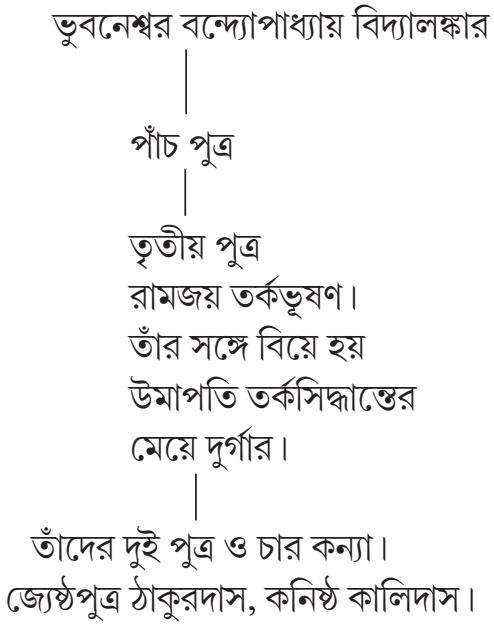

চার কন্যা
মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দময়ী ও অন্নপূর্ণা।
|
ঠাকুরদাসের সঙ্গে ভগবতী দেবীর বিয়ে।
তাঁদের সাতপুত্র ও তিনকন্যা।
|
সাতপুত্র
ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র,
হরিশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও ভূতনাথ।
|
তিন কন্যা
মনোমোহিনী, দিগম্বরী ও মন্দাকিনী।

।। দুই ।।

প্রিয়দর্শন হালদার সবিস্তারে লিখেছেন কেমন ভাগ্যবিপর্যয়ে বিদ্যাসাগরের মা ও বাবা, উভয়ের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল তাঁদের নিজ নিজ মাতুলালয়, তবে এক গ্রামে নয়। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী পাতুল গ্রাম, যেখানে বসতি বিদ্যাসাগরের মাতামহ পঞ্চানন তর্কবাগীশের।[১১] তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা বিবেচনায় অনেক খুঁজে উপস্থিত হলেন গোঘাটে (আরামবাগের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে), সেখানকার কুলীন ব্রাহ্মণ রামকান্ত তর্কবাগীশের (চট্টোপাধ্যায়ের) সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ে হয়ে গেল রামকান্তের সঙ্গে গঙ্গার। রামকান্ত প্রথমে ভালোই ছিলেন। থাকতেন তাঁর শিক্ষার্থীদের নিয়ে, গোঘাটে তাঁর চতুস্পাঠীতে। কিন্তু মেতে গেলেন তন্ত্রসাধনায়, পরিণামে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদগ্রস্ত।

খবর পেয়ে পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ জামাতা রামকান্ত, কন্যা গঙ্গা, দৌহিত্রী লক্ষ্মী ও ভগবতীকে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের কাছে পাতুলে। জামাইকে না এনে উপায় ছিল না। অভিভাবক বা সহোদর কেউ ছিল না তাঁর। রামকান্তের স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপে থাকার ব্যবস্থা হল। বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী প্রথমে মাতামহের ও পরে মামাদের স্নেহ-ভালোবাসায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকেন। ভগবতী দেবীদের নিজের কাছে আনার কিছুকালের মধ্যে পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ লোকান্তরিত হন; তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সহৃদয় ধর্মপরায়ণ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ 'পিতার অবিদ্যমানতায় অন্যান্য সহোদর ও সহোদরা এবং তাহাদের সন্তানগণের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়া পিতার সুনাম রক্ষার জন্য এক্ষণে তিনি যত্নবান হইলেন।[১২]

বিদ্যাসাগর জনক ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্যও টেনে নিন তাঁর মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রামে। হুগলি জেলার বনমালিপুর গ্রামের সংস্কৃত ভাষা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,

সঙ্গে অবস্থাসম্পন্ন ভুবনেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র রামজয় তর্কভূষণের সঙ্গে বিয়ে হয় বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা দুর্গার। ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় সরলমতি রামজয় সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধাবশত নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। অবস্থাবিপাকে দুর্গাকে তাঁর শ্বশুরালয়ে ছেড়ে আসতে হল পিত্রালয়ে, বীরসিংহে। পিত্রালয়ে তিনি (গঙ্গা দেবী) হয়ে পড়লেন অনাহুতা। পিতা উমাপতি বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁর সংসার পরিচালন করতেন তাঁর পুত্র-পুত্রবধূরা। তাঁদের মানসিক অত্যাচারে অতিষ্ঠা কন্যা দুর্গার জন্য উমাপতি নিজেই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, অদূরে নিজব্যয়ে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একটি কুঁড়েঘর। অতিকষ্টে দিনযাপন দুর্গার। চরকায় সুতো কেটে উপার্জন। রামজয় দুর্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও বড়ো হতে থাকলেন মাতুলালয়ে।

আবারও বলার, বিদ্যাসাগরের মা ও বাবা দু'জনেরই আশ্রয় মাতুলালয়, তবে এক গ্রামে নয়। ভগবতীর পাতুল গ্রামে। ঠাকুরদাসের বীরসিংহে। একটা বড়ো পার্থক্য— ভগবতী দেবী সস্নেহে, ঠাকুরদাস অপরিসীম দারিদ্র্যাবস্থায়। ঠাকুরদাসের কলকাতায় যাওয়া, ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে উপার্জন; উপার্জিত অর্থ সম্পূর্ণটাই পাঠিয়ে দিতেন মায়ের কাছে। ইংরেজি শিখে ঠাকুরদাসের চাকুরিগ্রহণ, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল জনমোহন ন্যায়লংকারের বদান্যতায়।

ভালোই চলছিল। সাত-আট বছর পরে নিরুদ্দেশ পিতা রামজয় এসে উপস্থিত হলেন তাঁর পিতৃনিবাস বনমালিপুরে। কাউকে না পেয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে বীরসিংহে। পিতৃপুরুষের ভিটেয় তাঁর প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েও, তাঁর ভাইদের কীর্তিকলাপ অবগত হয়ে থেকে গেলেন বীরসিংহে। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ঠাকুরদাসের সঙ্গে বিয়ে হল ন' বছর বয়সের ভগবতীর।

ভগবতী দেবী বালিকাবধূ। গ্রাম্যবধূ সে যুগের। তিনি প্রতিপালিতা গ্রামে। শ্বশুরবাড়িও গ্রামে। কিন্তু প্রতিকূল সমাজ-পরিবেশে 'স্বশিক্ষিত' হয়ে যে সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল-বস্তুবাদী চেতনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা অন্য কোনো জননীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। প্রিয়দর্শন হালদার ভগবতী দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের পরিচয় এ গ্রন্থে উপস্থিত না করলে বাঙালি এই প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর জীবনবৃত্তান্ত থেকে যেমন বঞ্চিত হত, তেমনই বিদ্যাসাগর যে মুখ্যত তাঁর মায়ের আদর্শেই হয়েছিলেন দয়ার সাগর, শিক্ষাব্রতী, পরোপকারী, বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের প্রবর্তক, এর অন্তরালের সত্য অনুধাবন অসম্পূর্ণ থাকত। ভগবতী দেবীর বাল্যকালে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভের সুযোগ হয়নি। 'কারণ দেশে তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে ভক্তি করিবে না, গৃহকর্ম্মে উপেক্ষা করিবে, স্ত্রীজনোদিত লজ্জা ও ধীরতায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রগলভা ও অশান্তপ্রকৃতি হইবে। এইরূপ অনিষ্ঠপাতের সকলে আশঙ্কা করিতেন।'[১৩]

এহেন পুরুষশাসিত, তদুপরি নিতান্ত একটি গ্রামে ভগবতী দেবী এসব আশঙ্কা মিথ্যে প্রতিপন্ন করে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

১. ভগবতী দেবীর মাতুলালয়ের গ্রামে—ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়স্থ, নাপিত প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণেতর জাতির বাস ছিল। তাঁর মাতুলালয়ের কাছাকাছি বাস করত অনেক তেওর ও বাগদী। ''ভগবতী বাল্যকালে এই সকল জাতীয় সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়ার মধ্যে তাঁহার এক বিশেষত্ব এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল সমবয়স্কা বালিকারা তাঁহাকে ক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি বলিতেন, 'তোমরা সকলে আমাদের বাটীতে এসো। আমরা একত্রে সবে খেলা করিব।''[১৪]

২. ভগবতী ছিলেন মিতচারিণী। সামান্য পদার্থকেও তুচ্ছজ্ঞান না করে, সবকিছুর সদ্ব্যবহার করতেন।

৩. 'উৎকৃষ্ট অশন, বসন ও ভূষণে তাঁহার (ভগবতী দেবী) আদৌ স্পৃহা ছিল না। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই তিনি পরিতুষ্ট হইতেন।'[১৫]

৪. বাল্যজীবনের তাঁর অন্য বিশেষত্ব 'দীনভাব'। অহংকার তাঁকে ক্ষণেকের জন্যেও স্পর্শ করতে পারেনি। দীনতাকে তিনি মনে করতেন, ভক্তিসাধনার প্রধান অঙ্গ।

৫. 'ভগবতী দেবীর বাল্যজীবনে তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দীনতার সহিত তেজস্বিতার সম্মিলন মণিকাঞ্চন সংযোগবৎ তাঁহার বালিকা হৃদয়ে পরম রমণীয় ভাবধারণ করিয়াছিল।' [১৬]

৬. দানশীলতা। মাতুলালয়ের সন্নিকটে বসবাসকারী দরিদ্র তেওর ও বাগদীদের তিনি মাঝেমধ্যেই অন্ন-আহার-বস্ত্রদান করতেন।

যৌবনসীমায় পদার্পণের আগেই ভগবতী দেবীর আগমন শ্বশুরালয়ে। স্বামী ঠাকুরদাসের আত্মসম্মানকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করলেন। '...পিতৃগৃহে নিতান্ত সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করিয়াও সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।... তিনি সেই দুঃখদারিদ্র্যময় সংসারে দগ্ধ হৃদয়ের শান্তিদাত্রী, নিরাশয়ের আশাদায়িনী, বিপদে বন্ধু, কৌতুকে সখী, রন্ধনে পাচিকা, ভোজনে জননী, সেবায় পরিচারিকাস্বরূপা ছিলেন। পতিসেবায়, দয়াদাক্ষিণ্যে, ও গুরুভক্তিতে তিনি এক আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন।'[১৭]

বিয়ের পর ভগবতী দেবীর বাল্যকালের সেবাধর্ম, দীনতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি আরও নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্তের পরিপক্কতা ও বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেল—

প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রীতিবন্ধন। কেউ ভালোবেসে তাঁকে কিছু দিলে সাদরে গ্রহণ করতেন। শাশুড়ির সঙ্গে কারো কখনও মনোমালিন্য ঘটবার উপক্রম হলে তিনি তাঁর শাশুড়িকে বিনীতবাবে বলতেন, 'মা, প্রভাতে উঠিয়া যাহাদের মুখ দেখিতে হইবে বা